আওয়ামী লীগের রাজনীতি

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আবার বিদেশ চলে গেলেন। এবার ইউরোপে পক্ষাধিককালের সফর। যাবার আগে আগামী বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বলে গেলেন। ধারণা করা হয়েছিল, তিনি বাজেটবিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবেন। কিন্তু সেটা ঠিক করার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন সহকর্মী প্রেসিডিয়াম সদস্যদের ওপর। তবে বলে গেছেন, বাজেট পাসের দিন ৩০ জুন যেন হরতাল থাকে। কারণ তাঁর শাসনামলে বিরোধী দলে থাকা বিএনপি এই দিন হরতাল দিত। এর আগে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রূপসা ব্রিজ উদ্বোধনের দিন শেখ হাসিনা হরতাল দেন। দলের নেতৃবৃন্দ, এগারো দল ও অন্যান্যরা ঐ হরতালের বিরোধিতা করলেও শেখ হাসিনাকে কেউ টলাতে পারেনি।

বস্তুত বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের জোট সরকার পতনের আন্দোলন এখন 'হরতাল'-এ সীমিত হয়ে গেছে। এই হরতাল এখনও কার্যত মফস্বলের কিছু অংশে পালিত হয়। ঢাকায় হরতালের দিন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ফটোসেশন করেন। আর আওয়ামী যুবলীগের মেয়েরা রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে কিছু ধস্তাধস্তি করেন। আওয়ামী লীগের ডাকা এই হরতাল এখন বিরক্তির উদ্রেক করা ছাড়া জনমনে বিশেষ কোনো সাড়া ফেলে না। অবস্থাটা এমনই দাঁড়িয়েছে, দলের সাধারণ সম্পাদক নিজেই হরতালের দিন তার ব্যাংকের এজিএম বাতিল করেন না। তাতে নিজেই উপস্থিত হন। শেখ হাসিনার ইচ্ছানুসারে আগামী ৩০ জুন বাজেটের বিরুদ্ধে হরতাল ডাকা হলে সেটা যে কেবল নিয়ম রক্ষা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অথচ একুশে আগস্টে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার পর জোট শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বিরোধী দলগুলো আওয়ামী লীগের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং নয় দফার ভিত্তিতে একটি যুগপৎ আন্দোলনের ধারাও ক্রমেই জনসমর্থন লাভ করে আরেকটি বড় ধরনের আন্দোলনের রূপ নিতে চলেছিল। একুশে আগস্টের পর সৃষ্ট এই আন্দোলনমুখী অবস্থা আওয়ামী লীগের 'এপ্রিল' আন্দোলনের ক্ষতকে মুছে দিয়েছিল। ঐ এপ্রিল আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সরকারের পতন ঘটবে। ঐ পতন ঘটানোর ট্রাম্পকার্ড তার হাতে মজুদ আছে।

জানা যায়, বিএনপি থেকে এমপিরা বেরিয়ে এসে বি. চৌধুরীর বিকল্প ধারায় যোগ দেবে এই আশা এবং তাদেরসহ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা পদত্যাগ করে সরকারকে সংসদ বাতিল করতে বাধ্য করবেন- এমনি একটি পরিকল্পনায় ৩০ এপ্রিলের আন্দোলনকে সাজানো হয়েছিল। কিন্তু জোট সরকার সময়মতোই ব্যাপারটা সামলে নিয়েছিল। তারা বিএনপির এমপিদের কোনো সুযোগই দেয়নি। অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে ৩০ এপ্রিলের 'ডেড লাইন'-এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

ড. কামাল হোসেন, এগারো দল ও বামদের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ অবশ্য একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিয়েছে। ড. কামালের মাধ্যমে বি. চৌধুরীর 'বিকল্প ধারা'কেও তারা সঙ্গে রাখতে চায়। 'বিকল্প ধারা অবশ্য কয়টি আসন চাইবে অথবা চাইতে পারবে সে হিসাব এখনো স্পষ্ট নয়

একুশে আগস্টের ঘটকে কেন্দ্র করে রাজনীতির বাতাস আওয়ামী লীগের পক্ষে চলে আসে। ড. কামালসহ এগারো দল, জাসদসহ অন্যরা আওয়ামী লীগের পাশে এসে দাঁড়ায়। জোট সরকারের আচরণ সরকার সম্পর্কেই জনমনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ঘনীভূত করে। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলের আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং গণঅনাস্থা প্রাচীরসহ বিরোধী দলের ধারাবাহিক কর্মসূচির সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কারণ সরকারে যারা থাকবে, দেশের মানুষ তাদের ওপর বিরক্ত হবে এটা খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। বাংলাদেশের মতো দেশে কারো পক্ষে সরকারে থেকে জনগণের সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। যে চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব আমাদের সরকারগুলো সেটাও করে না, করার চেষ্টাও করে না। এই কাজ ক্ষমতায় থেকে আওয়ামী লীগ করেছে, বিএনপিতে করেছে। নেতা-কর্মী, ক্যাডার, মন্ত্রী, আমলাদের দুর্নীতি একেক সরকারের সময় একেক মাত্রা লাভ করে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে চরম অগোছালোভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অকারণে তৈরি করা বিশাল মন্ত্রিসভা গুরুত্ব হারাচ্ছে দিন দিন। র‍্যাব গঠন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি একটা পর্যায়ের মধ্যে আনতে পারলেও অস্বাভাবিক হারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মানুষের জীবনকে নাভিশ্বাস করে তুলেছে। বাড়ছে তেল, সারসহ কৃষি উপকরণের মূল্য। আবার উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না কৃষক। গ্রামীণ সমাজে টাউটের সংখ্যা বাড়িয়েছে সরকার। গ্রাম সরকার গঠন করে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। গ্রামের মানুষ সরকারের এই বিষয়টিকে ভালোভাবে নেয়নি। সরকারের প্রতি তারা ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছে।

এই গ্রামগুলোতে শক্তিশালী ভিত আছে আওয়ামী লীগের। বাংলাদেশে এমন কোনো গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে আওয়ামী লীগের সংগঠন নেই। সংগঠনের চেয়েও নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মী আছে। তারা তাকিয়ে আছেন জাতীয় পর্যায়ের দিকনির্দেশনার দিকে। কিন্তু সেখান থেকে

কার্যকর কোনো দিক নির্দেশনা আসছে না। আসছে '৩০ এপ্রিল' বা হরতালের মতো উদ্ভট তত্ত্ব। ফলে হতাশ হয়ে পড়ছে নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীরা।

ইউনিয়ন পর্যায় তো দূরের কথা অনেক থানা পর্যায়েও বিএনপির শক্তিশালী কমিটি নেই। সাংগঠনিকভাবে বিএনপি বেশ দুর্বল। অন্তত আওয়ামী লীগের তুলনায়। তারেক রহমান সেই বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির দায়িত্ব নিয়েছেন। খুব জোর দিয়েই বলা যায় তিনি অনেকটা সফলও হয়েছেন। দেশব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিনিধি সম্মেলন করে তারেক রহমান রীতিমতো চমক দেখিয়েছেন। এ কথা সত্যি যে, এই সম্মেলনের পেছনে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। বিরোধী দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ বলতে চেয়েছে অর্থের বিনিময়েই লোকজন জড়ো করা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এটা অনেকটা আঙুর ফল টকের মতো বিষয়। তারেক রহমানের কাজের সাফল্য আওয়ামী লীগ নেতারা কথা দিয়ে মোকাবিলা করতে চাইছেন। আওয়ামী লীগের মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীরা এটা দেখে ক্রমেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। নেতাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না।

আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে শেখ হাসিনা কোথায় নিয়ে যেতে চান সে বিষয়ে তিনি নিজেও সম্ভবত পরিষ্কার নন। এখন সরকার পতনের আন্দোলন নাকি নির্বাচনের রাজনীতি- এ বিষয়ে আওয়ামী নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত। তারা জানে না যে তাদের কি করতে হবে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী চিকিৎসার কথা বলে দীর্ঘ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছেন। ফোন-ফ্যাক্সের মাধ্যমে বিরোধীদলীয় নেত্রী দেশে দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান প্রলম্বিত করা দলের মধ্যেই নেতিবাচক অবস্থা তৈরি করে। বিরোধী দলসমূহ এই সময়কালে নয় দফা অভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখলেও শেখ হাসিনার অবস্থান সবাইকে কিছুটা সন্দিগ্ধ করে তোলে। জানা যায়, দেশে আন্দোলনের চাইতে বিদেশে লবিংয়ের ওপর শেখ হাসিনা জোর দেন। এই লবিংয়ের জন্য দেশের সিনিয়র নেতৃত্ব বাদ দিয়ে তিনি তার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী, প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরুল্লাহ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে প্রবাসী আওয়ামী লীগারদের ওপর বেশি নির্ভর করেন।

শেখ হাসিনার এই যুক্তরাষ্ট্র অবস্থান খুব একটা কার্যকর হয়নি। তিনি নিজে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের তেমন কারো সঙ্গে যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ করতে পারেননি। অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে মার্কিন দূতাবাস বিশেষ করে রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস জোট সরকারের পক্ষাবলম্বন করেন। মার্কিন দূতাবাস জোটের শরিকদের অন্যতম জামায়াতের সঙ্গে বিশেষ রাজনৈতিক সখ্য গড়ে তোলে। জোট সরকারের বিরুদ্ধে ইসলামী জঙ্গিদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দানের যে অভিযোগ রয়েছে সে ক্ষেত্রে মার্কিন দূতাবাস জামায়াতকে নিউট্রালাইজিং ফ্যাক্টর হিসেবে বেছে নেয়। জামায়াতও মার্কিন প্রশাসনের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করাতে সক্ষম হয় যে, তারা একটি মডারেট ইসলামী লাইন অনুসরণ করছে এবং জোটকে সমর্থন করলেই কেবল দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে ইসলামী উগ্রপন্থার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র অবস্থানকালেই স্টেট ডিপার্টমেন্ট জামায়াত মহাসচিব ও জোট মন্ত্রী মুজাহিদকে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে নীতিনির্ধারকদের বৈঠক করিয়ে দেয়। বিএনপিও যুক্তরাষ্ট্রে তাদের লবি জোরদার করে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী চিকিৎসার কথা বলে দীর্ঘ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছেন। ফোন-ফ্যাক্সের মাধ্যমে বিরোধীদলীয় নেত্রী দেশে দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান প্রলম্বিত করা দলের মধ্যেই নেতিবাচক অবস্থা তৈরি করে।

শেখ হাসিনার অনুপস্থিতি ও তার রহস্যময় আচরণ দেশে আন্দোলনে ভাটা সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও সাবেক অর্থমন্ত্রী এসএএমএস কিবরিয়ার হত্যাকান্ড আওয়ামী লীগের ওপর বড় আঘাত হিসেবে এলেও এ ক্ষেত্রেও কোনো যথোপযুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি আওয়ামী লীগ। মাঝে মাঝে হরতাল দিয়ে চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেও আন্দোলন খুব একটা এগোয়নি।

আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি সামনে নিয়ে আসে। অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়টিও যুক্ত করে। ফলে আন্দোলন ও তার কর্মসূচির সমস্ত মনোযোগই তখন এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কারের ইস্যুর ওপর নিবদ্ধ হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাবনা উত্থাপন করতে পারেনি এ যাবৎ। বছরের শুরু থেকেই শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ উভয়ই বলতে শুরু করে এ ব্যাপারে তাদের বিশেষজ্ঞরা কাজ করছে। মার্চের দিকে এসে এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের একটি সাব কমিটি গোলটেবিলের মাধ্যমে একটি প্রাথমিক ধারণা বিরোধী দলসহ অন্যদের কাছে উত্থাপন করে। ইতিমধ্যে ড. কামাল, এগারো দল প্রমুখরাও তাদের বক্তব্য উত্থাপন করেন। ঠিক হয় যে, সবাই মিলে বসে একটি যৌথ প্রস্তাবনা তৈরি করা হবে এবং তার ভিত্তিতে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষিত হবে। কিন্তু এপ্রিল-মে এবং মধ্য জুন পেরিয়ে গেলেও তা নিয়ে বিরোধীদলসমূহের কোনো বৈঠক হয়নি। জানা গেছে, শীঘ্রই এ বৈঠক হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে শেখ হাসিনা ইউরোপ চলে গেছেন এবং বর্ষা মৌসুমে যেকোনো বড় ধরনের আন্দোলন হবে না সেটা অনুমান করা যায়। এর মাঝে হরতালসহ নানা ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচি আসতে পারে। তবে সেসব বড় ধরনের কোনো আন্দোলনের ইঙ্গিত দেয় না।

এ থেকেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা হয়েছে, জোট সরকারের পতন ঘটানোর যে কথা আওয়ামী লীগ বলে এসেছে, এখন তারা আর সে ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী নন। অবশ্য অনেকেই এখানে টাইম ফ্যাক্টরের কথা বলছেন। কারণ সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার এখনো ষোলো মাস বাকি। সুতরাং এত আগে আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে দিলে তার নিশ্চিত সাফল্য ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগের যে সাংগঠনিক অবস্থা তাতে তারা সেরকম কিছু ভাবতে পারছে না। বিশেষ করে ঢাকা মহানগরে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বেশ নাজুক। হানিফ-মায়া দ্বন্দ্বে নেতা-কর্মী, ক্যাডাররা দ্বিধাবিভক্ত। শেখ হাসিনা তাদের বারবার ওয়ার্নিং দিয়েছেন। তারা শুধু ফটোসেশনের জন্যে পাশাপাশি বসেছে। বিরোধ মেটেনি। দলকে চাঙ্গা করার কোনো উদ্যোগও তারা নেয়নি। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে নিজেদের সংহত করতে পারেনি। তাছাড়া গত তিন বছরে জোট সরকারের নির্যাতন-নিপীড়নের কারণে নির্বাচনী এলাকাসমূহেও আওয়ামী লীগ কাজ করতে পারেনি। এই নির্বাচনের হিসাবটাই আওয়ামী লীগের সামনে মুখ্য। সে কারণে যেকোনো আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার আগে আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনের হিসাবটি ঠিক করে নিতে চায়।

আর সেই হিসাবে সরকার পতনের আন্দোলনটি আপাতত কিছুটা ঝুলিয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনী প্রস্তুতিটি নিতে চায়। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দলীয় সংসদ সদস্যদের সেই নির্বাচনী প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে সাংগঠনিক সফরে নামিয়ে দেয়া হয়েছে দলের নেতাদের।

আগামী সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অন্যান্য বিরোধী দলকে সঙ্গে নিয়ে লড়বে বলে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে এবং সে ক্ষেত্রে ১০০টি আসন তাদের ছেড়ে দেবে। অবশ্য এ হিসাব পাল্টাতে পারে। কারণ শেখ হাসিনার জন্য সরকার গঠনের বিষয়টি মুখ্য। শরিকদের ১০০ আসন ছেড়ে দিলে তারা ঐ সব আসনে জিতে আসতে পারবে কি না সে প্রশ্ন রয়ে

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী চিকিৎসার কথা বলে দীর্ঘ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছেন। ফোন-ফ্যাক্সের মাধ্যমে বিরোধীদলীয় নেত্রী দেশে দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান প্রলম্বিত করা দলের মধ্যেই নেতিবাচক অবস্থা তৈরি করে।

গেছে। এছাড়া শরিক দলগুলোকে এতসংখ্যক আসন ছেড়ে দেয়ার পর সরকার গঠনে তাদের ভূমিকা কি হবে সেটাও বড় প্রশ্ন। আওয়ামী লীগের এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। একানব্বইয়ের নির্বাচনে ৩৫টি আসন তারা সিপিবি, ন্যাপ, বাকশালকে ছেড়ে দিয়েছিল। সেখান থেকে মাত্র ১১টি আসন পাওয়া গিয়েছিল। সরকার গঠনের প্রশ্নে সে সময় সিপিবি ও বাকশাল সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের বিনিময়ে বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন দেয়ার কথা বলেছিল। বিএনপি বরং দুটি মহিলা আসন দিয়ে জামায়াতের সমর্থন নেয়াই ভালো মনে করেছে। নৌকা প্রতীকে বিজয়ী সিপিবি'র বেশ কয়েকজন সাংসদ পরবর্তীতে বিএনপিতেও যোগদান করেন। ফলে বিরোধী দলকে আসন ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে সরকার গঠনে তাদের নিরঙ্কুশ সমর্থন পাবে কি না সেটা নিশ্চিত হতে চায়। বিশেষ করে এই ১০০টি ছেড়ে দেয়া আসনে বি. চৌধুরীর 'বিকল্প ধারা', এরশাদ ও মঞ্জুর জাতীয় পার্টিকেও আওয়ামী লীগ অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। কিন্তু এরশাদের কোনো তল তারা পাচ্ছে না। এরশাদকে চার দলের জোটে রাখতে বিএনপিও মরিয়া। এবং সে কারণেই এরশাদের দলের ভেতরে ও বাইরে উভয় দিক থেকে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে তার ওপর। ইতিমধ্যে বিদিশার ঘটনা দিয়ে এরশাদকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে বিএনপি। এ ব্যাপারে রওশন এরশাদ, কাজী জাফর, রুহুল আমীন হাওলাদার প্রমুখ বিএনপির হয়ে জাতীয় পার্টিতে কাজ করছেন।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জুও তার নির্বাচনী জোট কার সঙ্গে বাঁধবেন ঠিক করেননি। তাকেও বিএনপি হাতে রেখেছে। হাতে আছে কাদের সিদ্দিকীও।

কাদের সিদ্দিকীকে অবশ্য ড. কামাল হোসেন বিরোধী পক্ষে রাখার চেষ্টা করছেন। এ ক্ষেত্রে কদের সিদ্দিকীর সঙ্গে নির্বাচনী কি রফা হবে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

ড. কামাল হোসেন, এগারো দল ও বামদের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ অবশ্য একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিয়েছে। ড. কামালের মাধ্যমে বি. চৌধুরীর 'বিকল্প ধারা'কেও তারা সঙ্গে রাখতে চায়। 'বিকল্প ধারা অবশ্য কয়টি আসন চাইবে অথবা চাইতে পারবে সে হিসাব এখনো স্পষ্ট নয়। আওয়ামী লীগ বিকল্প ধারার ক্ষেত্রে বি. চৌধুরী, মাহী চৌধুরী, মেজর (অবঃ) মান্নানসহ ১০-১৫ জনের আসনের কথা ভেবে রেখেছে।

ড. কামাল হোসেনের গণফোরামের জন্যও একই সংখ্যক আসনের কথা আওয়ামী লীগ ভাবছে। তারা অবশ্যই ড. কামালকে সংসদে দেখতে চান। ড. কামালের কোনো নির্দিষ্ট আসন নেই। মিরপুরের যে আসনে তিনি '৮৬ ও '৯১-তে নির্বাচন করেছিলেন, সেই আসনই তাকে দেয়া হবে। সাইফুদ্দিন আহম্মেদ মানিক ডেমরার আসন চান। তবে সেটা পাওয়া নাও যেতে পারে। অ্যাডভোকেট জহুরুলকে কক্সবাজার আসন দেয়া হবে।

এগারো দল বামফ্রন্টের মাঝে রাশেদ খান মেনন, ফজলে হোসেন বাদশা, মনজুরুল আহসান খান, বিমল বিশ্বাস, মুজাহেদুল ইসলাম সেলিমকে আসন দেয়া হবে বলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ঠিক করেছে। তবে বিমল বিশ্বাসের আসন নিয়ে দলের মাঝেও সমস্যা আছে। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহী নন। গণতন্ত্রী পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য টিইউসি নেতা নূরুল ইসলামের চাটখিল আসনপ্রাপ্তি কিছুটা নিশ্চিত। তবে ওয়ার্কার্স পার্টি ও সিপিবিসহ এগারো দল ৫০-এর অধিক আসন চাইতে পারে। অবশ্য এ নিয়ে এসব দল অথবা চৌদ্দ দলে কোনো আনুষ্ঠানিক কথা হয়নি। ওয়ার্কার্স পার্টি তার গত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় নির্বাচন প্রসঙ্গে পার্টির কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছে। ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সিপিবির সভাপতি মনজুরুল আহসান খান জনসভায় বক্তৃতায় বলেছেন, এবার সংসদে বামপন্থিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে চান। ড. কামাল বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচন অর্থহীন মনে করলেও নির্বাচনে দুর্নীতিবাজ, অসৎ ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে সৎ, আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীদের মনোনয়ন দেয়ার কথা বলেছেন নিউইয়র্কে তার সাম্প্রতিক বক্তৃতায়।

সে হিসেবে বলা চলে, আনুষ্ঠানিক আলোচনা না হলেও আওয়ামী লীগ ও এগারো দল উভয়ে নির্বাচনী সমঝোতার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

অপরদিকে জাসদ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন ও ঐক্যবদ্ধ সরকারের স্লোগান দিচ্ছে। এ নিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গেও তাদের কথা হয়েছে। কতটি আসনে তারা ছাড় পাবে জাসদ সেটা নিশ্চিত হতে চাইলেও আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনা এ নিয়ে এখনই কোনো কথা বলেননি।

আন্দোলনরত অন্যান্য দলের ব্যাপারে শেখ হাসিনার মনোভাবও স্পষ্ট। সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, গণআজাদী লীগের হাজী আবদুস সামাদকে তারা কোনো আসন দেবে না। তবে তাদের সরকারে নেয়া হবে। এজন্য প্রয়োজনে আগাম প্রতিশ্রুতিও প্রদান করবে তারা।

দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এটা স্পষ্ট যে, আওয়ামী লীগ সরকার পতনের খেলা অব্যাহত রাখলেও তার রাজনীতির মূল অভিমুখটি নির্বাচনের দিকে। আগামী দিনগুলোতে এই নির্বাচনের বিষয়ই আরো মুখ্য হয়ে উঠবে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়ে কোনো কথা না হলে পরিস্থিতি সংঘাত-সংঘর্ষে রূপ নেবে। সে ক্ষেত্রে বিএনপি আরেকটি ফেব্রুয়ারির নির্বাচন করতে পারে। তবে সেটা তাদের জন্য কেবল নয়, দেশের সংসদীয় ব্যবস্থার জন্যই ভয়ঙ্কর হবে। হ্যারি কে টমাস যে তৃতীয় শক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন, আপাতদৃষ্টিতে তার সম্ভাবনা না থাকলেও বিষয়টি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। আওয়ামী লীগ সিইসি নিয়োগের বিষয়টি মেনে নিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টিও এমন হবে কি না, বোঝা যাচ্ছে না। যদি তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুতে আওয়ামী লীগ অনড় থাকে তবে সংঘাত অনিবার্য। দেশের মানুষ সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়। এর জন্য যা করা প্রয়োজন সেটা করার পক্ষে তারা। জনগণ সংঘাত দেখতে চায় না। তারা চায় আওয়ামী লীগ-বিএনপি একত্রিত হয়ে দেশের স্বার্থে কাজ করবে। জনগণের এই চাওয়ার মূল্য দেয়ার কথা ভাবতে হবে রাজনীতিবিদদের। না ভাবলে জনগণ তাদের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে।

দেশ এবং জনগণের স্বার্থেই হ্যারি কে টমাসের ইঙ্গিত সত্য হওয়া উচিত নয়।